RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume VIII, No. 1 / APRIL, 2023, pp. 52-62.

স্বস্তি মৃত্যু

Sabina Jesmin
Assistant Professor,
Department Philosophy,
Chakdaha College,
Chakdaha, Nadia, India.
sabinajesmin10@gmail.com

Structured Abstract:

উদ্দেশ্য (Purpose): প্রাচীন গ্রীস ও রোমে, ভারতবর্ষে মহাভারতের যুগ থেকেই স্বেচ্ছামৃত্যু বা কৃপামৃত্যু তথা স্বস্তিমৃত্যু (Euthanasia) চলে আসছে। সর্বকালে সমাজের কিয়দংশে যে এর প্রভাব পড়ছে তা পূর্ব ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই জানা যায়। সমাজে বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যখন জীবন – মৃত্যুর মধ্যে কোনো প্রভেদ করতে পারে না, তখন তারা স্বেচ্ছামৃত্যুর পথটাই বেছে নিতে চায়। সাম্প্রতিককালে সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে পাশ হওয়া আইনের ভিত্তিতে মানুষের 'শেষ ইচ্ছা'কে সম্মান জানানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

পদ্ধতি (Methodology): উল্লিখিত বিষয়টির স্বরূপ উদঘাটনের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন (Report), পুস্তক, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে তথ্য আহরণ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগেও এই বিষয়ের গুরুত্ব কতখানি তা যতটা সম্ভব তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

উপপদ (Findings): প্রাচীন গ্রীক যুগে বিকলাঙ্গ শিশুর ক্ষেত্রে কৃপাহত্যাকে অনুমোদন করা হয়েছিল। ভারতবর্ষেও প্রাচীনকাল থেকে কৃপামৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়ে আসছে যদিও মৃত্যুর তথা হত্যার অধিকার নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই বিতর্ক চলে আসছে। ১৯৫২ সালে ব্রিটিশ এবং আমেরিকার ইউথেনেশিয়া সোসাইটির পক্ষ থেকে ইউনাইটেড নেশন কমিশন- এর কাছে একটি পিটিশনের মাধ্যমে আবেদন জানানো হয় স্বেচ্ছামৃত্যুকে মানুষের অধিকার হিসাবে বিবেচনা করার জন্য। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত স্বেচ্ছামৃত্যু কোনোরকম আইনি স্বীকৃতি পায় নি। ১৯৯৭ সালে চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে মৃত্যুর পক্ষে প্রথম

আইন 'দ্য অরিগন ডেথ উইথ ডিগনিটি অ্যাক্ট' পাশ হয় আমেরিকায়। ২০১৭ সালে ১০ই অক্টোবর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্ট নিষ্ক্রিয় কৃপামৃত্যুকে (Passive Euthanasia) অনুমোদন করে আইন প্রণয়ণ করে।

মৌলিকতা (Originality): সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একদিকে যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিবর্তন হচ্ছে তেমনি মানুষের মানসিকতারও পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। বর্তমানে মানুষ বুঝতে শিখেছে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার যেমন সকলের আছে তেমনি মৃত্যুকে স্বাগত জানানোর অধিকারও আমাদের আছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকার কোন অর্থই খুঁজে পায় না, যখন কেউ অনুভব করে এই বিশ্বসংসারে তার অস্তিত্বের লড়াই শেষ হয়েছে, যখন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অসহনীয় অনন্ত রোগ যন্ত্রণায় সামিল হয়ে আর্থিক দিক থেকেও সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে তখনই একমাত্র সে মৃত্যুর অধিকার দাবি করে। কাজেই কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে জীবন -মৃত্যুর মধ্যে কোনটা বেশী গ্রহণযোগ্য – সেই বিষয়টির উপর আলোকপাত করার জন্য এটি একটি সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন।

Paper Type: বিশ্লেষণমূলক (Analytical)।

Keywords: কৃপামৃত্যু, নিষ্ক্রিয় মৃত্যু, ডাক্তার-সহযোগী আত্মহত্যা (Physician – Assisted Suicide), ডিগনিটাস।

ভূমিকা

স্বেচ্ছামৃত্যু তথা কৃপামৃত্যুর বিষয়টি সাম্প্রতিক কালের নৈতিক দর্শন তথা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহু বিতর্কিত বিষয়।বর্তমানের চর্চার বিষয় হলেও স্বেচ্ছামৃত্যুর ব্যাপারটা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্য – সর্বত্রই প্রচলিত। মহাভারতকার ব্যাসদেবের প্রপিতামহ বশিষ্ঠ আত্মহত্যা করবেন বলে নিজের হাত-পা বেঁধে বর্ষার জলে পূর্ণ খরস্রোতায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্র ও পূরাণে দুই ধরনের আত্মহত্যার কথা বলা হয়েছে – বৈধ ও অবৈধ। নিষ্কৃতি মৃত্যু হল এক ধরনের বৈধ আত্মহত্যা। কেউ যদি ক্রোধবশতঃ বা অভিমানের কারণে আত্মহননের পথ বেছে নেয় সেই আত্মহত্যা হবে অবৈধ। ঈশোপনিষদেও আত্মঘাতীর নরক গমনের কথাও বলা হয়েছে। মহাভারতও এই ধরনের আত্মহত্যার নিন্দা

করেছে। এরূপ আত্মঘাতীদের পারলৌকিক কর্মেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি বেদান্ত জ্ঞানের অধিকারী, সংসারের অনিত্যতাকে সংশয় ও বিপর্যয়হীন চিত্তে জেনেছেন, তিনি যদি নিজের ইচ্ছায় জীবনের প্রতি বীতরাগ হয়ে কোন পবিত্র স্থানে অনশনের দ্বারা প্রাণ বিসর্জন দেন, তবে সেই স্ববধ হবে বৈধ। আবার আর এক ধরনের বৈধ আত্মহত্যাও মহাভারতে লক্ষ্য করা যায়। যে রোগ উপশমযোগ্য নয় সেই দুরারোগ্য রোগের কারণে যদি কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় সেই আত্মহত্যা হবে শাস্ত্রসম্মত। ধর্মশাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে এই ধরনের স্ববধ-এর উদ্দেশ্য মোক্ষপ্রাপ্তি বা পাপস্খলন নয়, বরং তা জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য। শেষ জীবনে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয় অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই অরণ্যে হঠাৎ দাবানল জ্বলে উঠলে ধৃতরাষ্ট্র সেই আগুনে আত্মহুতি দিয়েছিলেন। গান্ধারী ও কুন্তী তাঁকে অনুসরণ করলেন। তখন জীবনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে – এই সত্যকে অনুধাবন করে ব্রহ্মচারী সঞ্জয়ও মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় মহাভারতীয় নীতিবিদ্যায় নিষ্কৃতি মৃত্যুর বৈধতা প্রশ্নাতীত।

পাশ্চাত্যেও স্বেচ্ছামৃত্যু যে কোনো কোনো দেশে অনুমোদিত ছিল তা প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের রচনায় পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসে বিকলাঙ্গ শিশুর ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামৃত্যু স্বীকৃত ছিল। প্লেটো তাঁর ‘Republic’ গ্রন্থে বলেছেন যে, রাষ্ট্র যে সমস্ত শিশুকে দুর্বল ও বিকলাঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করত তাদেরকে একটি অজ্ঞাত জায়গায় সরিয়ে রাখত। অ্যারিস্টটল তাঁর ‘Politics’ গ্রন্থে একই ধরনের কথা বলেছেন। প্লেটোর মতে কোন ব্যক্তি যদি এমন কোনো দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয় যার ফলে রাষ্ট্রকে দেবার মতো তার কিছু না থাকে তাহলে চিকিৎসকের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত নয়। চিকিৎসা প্রয়োগেরও সীমা থাকা দরকার। একজন ব্যক্তির জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের স্বার্থ অগ্রগণ্য। যে রোগীর অস্তিত্ব রাষ্ট্রের কাছে মূল্যহীন তার ক্ষেত্রে প্লেটো কৃপহত্যাকে সমর্থন করেছেন। প্রাচীন গ্রীসে যে সকল চিকিৎসক কৃপাহত্যায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন তাঁরা প্রশংসার পাত্র ছিলেন। রোমে স্টোয়িক দার্শনিকগণ দুর্বল ও বিকলাঙ্গ শিশুদের হত্যা করার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। Epistolae Mordles গ্রন্থের অন্তর্গত Seneca-র একটি উক্তি থেকে সুন্দরভাবে আমরা জীবন-মৃত্যুর সেতুবন্ধন গড়তে পারি – “Living is not the good, but living well. The wise man therefore lives as long as he should, not as long as he can. He will think of life in terms of quality, not

quantity.” অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বেঁচে থাকা নয়, ভালোভবে বাঁচার মত বেঁচে থাকা। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাই যতদিন বাঁচতে পারেন ততদিন না বেঁচে যতদিন বাঁচা উচিত ততদিন বাঁচেন। তাঁরা জীবনকে বিচার করেন জীবনের দৈর্ঘ্যের মানদণ্ডে নয়, উৎকর্ষতার মানদণ্ডে। কাজেই এখনেও স্পষ্টত্ঃ লক্ষ্যণীয় সুদীর্ঘ যন্ত্রণাময় জীবনের তুলনায় স্বেচ্ছামৃত্যু বা কৃপাহত্যাই শ্রেয়।

বিষয়বস্তু

‘ইউথানেসিয়া’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হতে পারে তিন প্রকারের – (১) শান্তিপূর্ণ মৃত্যু, (২) শান্তিপূর্ণভাবে মৃত্যু ঘটানোর পদ্ধতি, (৩) এই ধরনের মৃত্যু ঘটানোর কাজটি স্বয়ং। কিন্তু এই অভিধানিক অর্থ গ্রহন করলে কৃপাহত্যা বা স্বস্তিমৃত্যু নিজেই তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শুধু কৃপাহত্যাই শান্তিপূর্ণ মৃত্যু না হয়ে নিতান্ত স্বাভাবিক মৃত্যুও শান্তিপূর্ণ মৃত্যু হতে পারে। আবার কোন বিচক্ষণ খুনী পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে এমনভাবে কোন নিরীহ মানুষকে খুন করতে পারে যেখানে হতভাগ্য মানুষটিকে বিন্দুমাত্র মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় নি।কাজেই অভিধানিক অর্থটি ইউথ্যানেসিয়ার একটি দিক মাত্র। স্বস্তিমৃত্যুর সবচেয়ে বড় কথা হল মৃত্যুটি তার কাছে আশীর্বাদ না অভিশাপ। কৃপাহত্যার ক্ষেত্রে হত্যার মূলে থাকে সমবেদনা বা সহানুভূতি। এই হত্যার মধ্য দিয়ে দয়া প্রদর্শন করা হয়। জীবন রক্ষা করাটাই সর্বদা মহানুভবতার পরিচয় নয়। যদি কোন মানুষ এমন এক রোগে আক্রান্ত হয় যা অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ক এবং এপর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে রোগের উপশম একেবারেই অসম্ভব তাহলে সেই রোগের থেকে মুক্তির পথ মৃত্যু ছাড়া আর কী হতে পারে? এই রোগীকে বিভিন্ন জীবনদায়ী ওষুধ প্রয়োগ করে জীবনকে দীর্ঘায়িত করার পরিণাম হল তার যন্ত্রণাকে দীর্ঘস্থায়ী করা। এক্ষেত্রে জীবন যখন দুর্বিষহ, উপশমের কোনো পথ নেই তখন মৃত্যুই তার কাছে অধিকতর কাম্য হয়ে ওঠে। কারো জীবনে যদি নূন্যতম সুখও না থাকে তাহলে তার কাছে জীবন-মৃত্যুর মধ্যে কোনো ছেদবিন্দু থাকে না। সেক্ষেত্রে মৃত্যুই কাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়ে। জীবন যে সদা মঙ্গলময় বার্তা বহন করে তা নয় – এর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ক্যান্সার রোগী যখন ঐ রোগের শেষ পর্যায়ে পৌঁছায় তখন তার যে হৃদয়বিদারক আর্তি তা শুনেই যে কোনো ব্যক্তির বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ঐ রোগী

যেকোনো প্রকারে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। চিকিৎসকেরা হয়তো সাময়িক যন্ত্রণা লাঘবের জন্য কোনো ওষুধ বা ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তাঁরাও জানেন ঐ রোগীর পক্ষে আর কোনোভাবেই সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান এখানে ব্যর্থ। ওই রোগীর কাছে জীবন দুর্বিষহ, অর্থহীন। বেঁচে থাকাটাই যন্ত্রণাদায়ক। এই কষ্ট থেকে অব্যাহতির ক্ষেত্রে কৃপহত্যাই বোধ হয় একমাত্র কাম্য।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় অভিধানিক অর্থ ত্যাগ করে বর্তমানে স্বস্তিমৃত্যুকে আমরা যে অর্থে গ্রহন করতে চাইছি তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায় – (১) এটা এক ধরনের প্রাণহরণ (২) এক্ষেত্রে দুরারোগ্য ও নিদারুণ যন্ত্রণাক্লিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি থাকবে, (৩) ঐ যন্ত্রণাক্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি দয়াপরবশ কেউ না কেউ থাকবেন, যেমন চিকিৎসক, (৪) যন্ত্রণাক্লিষ্ট হতভাগ্য ব্যক্তিকে এই দয়ালুচিত্ত মানুষেরা তুলনামূলক যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর কোলে তুলে দেবে। এক্ষেত্রে প্রানহরণ নৈতিক দিক অবৈধ নয়। অসহনীয়, অনোপশমীয় যন্ত্রণা থেকে কোনো ব্যক্তিকে মুক্তির পথ দেখানোই এখানে কর্তব্য। যখন মানুষের চেতনা জাগ্রত থাকে না, মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তখন সেই মৃৎকল্প জীবনকে অর্থহীনভাবে বহন করার তুলনায় মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে মনে হয়। তখনই স্বস্তিমৃত্যু প্রার্থনা করা হয়। স্বস্তিমৃত্যু হত্যাজনিত হলেও যার মৃত্যু ঘটানো হয় তার কাছে এই হত্যা অপেক্ষাকৃত শান্তি ও মুক্তির বার্তা বহন করে। এখানে উল্লেখ্য যে স্বস্তিমৃত্যু কৃপাহত্যার ফল; কৃপাহত্যা স্বস্তিমৃত্যুর উপায়। যে ধরনের হত্যার দ্বারা স্বস্তিমৃত্যু ঘটে তাই হল কৃপাহত্যা। এখানে হত্যার উদ্দেশ্য ব্যধিগ্রস্থ যন্ত্রণাক্লিষ্ট রোগীকে শান্তি দান করা।

'দ্য গার্ডিয়ান'–এ জো উইলসনের প্রকাশিত ‘I took my mother to Dignitas’ প্রবন্ধে স্বস্তিমৃত্যুর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ডিগনিটাস-এর পুরো কথা হল 'টু লিভ উইথ ডিগনিটি, টু ডাই উইথ ডিগনিটি। ‘ডিগনিটাস’ হল 'সুইস নন প্রফিট মেম্বার সোসাইটি' যা আত্মহত্যায় সহায়তা করে এবং মৃত্যুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনি লড়াই–এ সামিল। এর প্রতিষ্ঠাতা লুডভিগ মেনেলি নিজেও প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। ডিগনিটাসে আত্মননকারীর হাতে কিছু সময়ের ব্যবধানে নির্দিষ্ট মাত্রায় ‘পেনটোবারবিটাল’ তুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দফায় পানীয়ের সঙ্গে এটি খাওয়ার তিন-চার মিনিটের মধ্যে তীব্র ঘুম চলে আসে।

এক্ষেত্রে মৃত্যু আসে 'রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট'-এর মাধ্যমে। অসহনীয় যন্ত্রণাক্লিষ্ট অনারোগ্য রোগীর কাছে এর চেয়ে স্বস্তির মৃত্যু আর কি বা হতে পারে!

বিভিন্ন দিক থেকে স্বস্তিমৃত্যুর প্রভেদ করা হয়। মৃত্যু ঘটানোর উপায় – এর দিক থেকে স্বস্তিমৃত্যু দুই প্রকার – সক্রিয় (Active) এবং নিষ্ক্রিয় (Passive)। যন্ত্রণাক্লিষ্ট রোগীকে অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে সরাসরি মুক্তি দেবার লক্ষ্যে প্রাণহরণের ব্যবস্থা করা হল সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু। এক্ষেত্রে প্রাণঘাতী ইনজেকশন বা অতিরিক্ত পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণার মৃত্যুর ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ক্যান্সার রোগী যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন চিকিৎসক তার আয়ুকে দিন থেকে ঘণ্টায় পরিমাপ করে। রোগী নিজেও বুঝতে পারে বিশ্বসংসারে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পৌঁছে যন্ত্রণাতুর রোগী জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজে স্বেচ্ছায় চিকিৎসকের কাছে যন্ত্রণা লাঘবের জন্য মৃত্যুকামনা করে থাকেন। সেই পরিস্থিতিতে চিকিৎসক ঐ রোগীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করে প্রাণঘাতী ইনজেকশন বা অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খাইয়ে যথাসম্ভব যন্ত্রণাহীন কৃপাহত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। তবে এই ধরনের সক্রিয় কৃপাহত্যা ভারতবর্ষ তো বটেই, অনেক দেশেই আজও বেআইনি।

নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে চিকিৎসক বা অপর কেউ কিছু করে না। এক্ষেত্রে রোগীর চিকিৎসা বা প্রাণদায়ী ব্যবস্থাগুলি প্রত্যাহার করে নিয়ে মৃত্যুর ব্যবস্থা করা হয়। সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে যেখানে মৃত্যু ঘটানো হয় সেখানে নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটতে দেওয়া হয় বা মৃত্যুমুখে যেতে অনুমতি দেওয়া হয় (letting die)। এখানে মৃত্যুর কারণ অপর কেউ নয়, স্বয়ং তার অনারোগ্য ব্যাধি। Peter Singer তাঁর Practical Ethics বইতে 'স্পাইনাল বাইফিডা' নামক একটি কালান্তক জন্মগত রোগের কথা বলেছেন। এই রোগে শিশুর জন্ম হয় শরীরের পিছনে একটি গর্ত নিয়ে। শিশুর স্পাইনাল কর্ড এই পথে বাইরে বেরিয়ে আসে। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে এই রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না, ফলে কিছুদিনের মধ্যে শিশুরা মারা যেত। ১৯৫৭ সালে আমেরিকান ডাক্তাররা 'হোল্টার ভালভ্' নামে একটি যন্ত্রের সাহায্যে এই রোগের চিকিৎসা শুরু করেন। এতে শিশু মৃতুর হার কিছুটা কমলেও অধিকাংশ শিশু প্যারালাইসিসের

শিকার, শরীরের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, কেউ বা মানসিক প্রতিবন্ধী, প্রায় প্রত্যেকের মেরুদন্ড আর পা অস্বাভাবিক। আবার এই হোল্টার ভালভ্' যন্ত্রণাটিকে সচল রাখার জন্য বারংবার শিশু শরীরে অস্ত্রোপচার করতে হচ্ছে। এই ধরনের পরিণতি দেখে ব্রিটিশ চিকিৎসক জন লোরবার প্রস্তাব দেন যে, ঐ রোগাক্রান্ত প্রতিটি শিশুর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। যারা অপেক্ষাকৃত কম ত্রুটি নিয়ে জন্মেছে তাদের ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হোক, বাকিদের ক্ষেত্রে প্রত্যাহার করা হোক। যাদের জন্মগত ত্রুটি মারাত্মক তাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত হয় ঠিকই, কিন্তু তারা মরে বাঁচে। এক্ষেত্রে দুর্বিষহ জীবন বহন করা অপেক্ষা মৃত্যু তাদের কাছে এবং তাদের পরিজনদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। এই ধরনের মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া হয় না, আবার জীবনদায়ী ব্যবস্থাও দেওয়া হয় না। নিষ্ক্রিয় বা পরোক্ষ স্বস্তিমৃত্যু এইভাবে শান্তিপূর্ণ মৃত্যুকে আহ্বান জানায়। ভারতবর্ষ তথা বহু দেশেই এই নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু আইনি রক্ষাকবচ পেয়েছে।

মুমূর্ষ ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে স্বস্তিমৃত্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় - ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু (Voluntary Euthanasia), অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু (Involuntary Euthanasia) এবং ইচ্ছা-নিরপেক্ষ স্বস্তিমৃত্যু (Non-voluntary Euthanasia)। যখন কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছানুসারে অনারোগ্য ব্যাধি ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার জন্য তারই কল্যাণার্থে তার মৃত্যুতে সাহায্য করা হয় তখন তাকে 'ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু' বলা হয়। ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে মুক্তিকামীর আত্মহত্যায় অপর কোনো ব্যক্তি সাহায্য করে কারণ ঐ ব্যক্তি মৃত্যুতে ইচ্ছুক হলেও শারীরিক কারণে আত্মহত্যায় অসমর্থ। এজন্য ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুকে 'অন্যের সাহায্যপুষ্ট আত্মহত্যা' (assisted suicide) বলে অনেকে মনে করেন। এক্ষেত্রে পিটার সিঙ্গারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। ১৯৭৩ সালে জর্জ ঝিগম্যানিয়াক নামে নিউ জার্সির এক বাসিন্দা মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আঘাত পান। এর ফলে গলার নিচ থেকে সম্পূর্ন শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছিল এবং সঙ্গে ছিল তীব্র যন্ত্রণা। এমতাবস্থায় তিনি আর বেঁচে থাকতে চান নি, তিনি মৃত্যুভিক্ষা চেয়েছিলেন। পরে অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি বাকশক্তিও হারিয়ে ফেলেন। আরোগ্যলাভের কোনো আশা নেই জানতে পেরে তাঁর ভাই লেস্টার তাঁর সম্মতিক্রমে কপালে গুলি করেন। এটি ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু হলেও বলা যায় জীবননাশের ঘটনাটি আরো একটু

বেদনাহীন হতে পারত যদি কোন প্রাণঘাতী ইনজেকশন বা ঘুমের ওষুধের সাহায্যে মৃত্যুকে আহ্বান জানানো হতো।

অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে রোগী নিজ মৃত্যু সম্পর্কে সম্মতি দানে সমর্থ হলেও সম্মতি দেন নি। এক্ষেত্রে হতে পারে মৃত্যুর প্রস্তাব তার কাছে আসে নি, অথবা জিজ্ঞাসাবাদের পরেও জীবন ধারনের ব্যাপারে মনস্থির করতে পারে নি। যে সম্মতি দেয় নি এমন ব্যক্তির জীবন নাশ করাকে তখনই স্বস্তিমৃত্যু বলা হবে যখন এই ধরনের প্রাণহরণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দেয়। এই ধরনের অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর ঘটনা অবশ্য বাস্তবে বিরল।

যখন কোনো ব্যক্তি জীবন-মরণের প্রভেদটাও উপলব্ধি করতে পারে না অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবার অবস্থায় থাকে না সেক্ষেত্রে তার স্বস্তিমৃত্যু আয়োজন করা হলে সেটি হবে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ স্বস্তিমৃত্যু। যেসব শিশু মারাত্মকভাবে বিকলাঙ্গ বা গুরুতরভাবে মানসিক প্রতিবন্ধী এবং বার্ধক্য-দুর্ঘটনা-অসুস্থতার কারণে যারা জীবন মৃত্যুর ভেদাভেদ চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে – তারাই এই ধরনের স্বস্তিমৃত্যুর পাত্র হতে পারে। পিটার সিঙ্গারকে অনুসরণ করে লুইস রেপৌলির পুত্র সন্তানের প্রাণহরণের ঘটনাটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। পুত্রটি অনারোগ্যভাবে জড়ধী, শৈশব থেকেই শয্যাশায়ী, পাঁচ বছর বয়স থেকেই অন্ধ। সে কথা বলতে, হাঁটতে – এককথায় কিছুই পারতো না। অবশেষে রেপৌলি তাকে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে জীবনের ইতি টেনে দেয়। বহুদিন ধরে কোমায় আচ্ছন্ন রোগীর ক্ষেত্রেও এই ধরনের স্বস্তিমৃত্যু আশীর্বাদ-স্বরূপ।

সিদ্ধান্ত

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বস্তিমৃত্যুর কতকগুলি সমর্থনযোগ্য দিক আমরা দেখতে পাই। নৈতিক দিক থেকে দেখলে স্বাধীনভাবে কোনো কিছু বেছে নেওয়ার অধিকার প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তখনই বাধা দিতে পারে যখন কোনো স্বেচ্ছাচয়ন অপরের ক্ষতির কারণ হয়। স্পষ্টতঃই যে অভাগা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণ দিতে চায় সে আর যাই করুক অপরের ক্ষতিসাধন করে না। কাজেই এই দিক থেকে স্বস্তিমৃত্যুকে ব্যক্তিস্বাধীনতার একটি অনুমোদনযোগ্য কর্মধারা হিসেবে গণ্য করা উচিত।

অনারোগ্য যন্ত্রণাক্লিষ্ট রোগীর কাছে আত্মমর্যাদা রক্ষাও একটা বড় প্রশ্ন। একদিকে অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা অপরদিকে যখন সে বুঝতে পারে আত্মীয়-পরিজন তথা সমাজসংসারে তার অবস্থান নিছক বোঝাস্বরূপ তখন সে এক নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করে; প্রতিনিয়ত ঐ মৃত্যুপথযাত্রী মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকে। এই অবস্থায় যদি সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে চায় তাকে বাধা দেওয়া বোধ হয় কোনোভাবেই যথাযথ হবে না। এই প্রসঙ্গে আইরিশ ব্যাঙ্গরচনাকার জোনাথন সুইফ্ট–এর কথা বলা যায়। তাঁর দৃষ্টিশক্তিহীন দুটি চোখের যন্ত্রণা এত তীব্র হতো যে চোখ দুটি উপড়ে ফেলতে চাইতেন। যন্ত্রণা বিধ্বস্ত হয়ে যাতে আত্মহত্যা না করতে পারেন সেজন্য ধারালো যন্ত্রপাতি তাঁর কাছ থেকে দূরে রাখা হত। এইভাবে আট বছর তাঁকে অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। শেষে একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা খিঁচুনির পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এমতাবস্থায় যন্ত্রণাকে দীর্ঘায়িত করার তুলনায় স্বস্তিমৃত্যুর ব্যবস্থা করাই বোধ হয় নৈতিক দিক থেকে কাম্য।

উল্লেখ্য যে, যে কর্মনীতিকে সর্বজনীন নীতিতে পরিণত করা সম্ভব একমাত্র তারই নৈতিকতা গ্রাহ্য। অন্য সকলের কাছে আমি যে রকম আচরণ আশা করবো, অন্যের প্রতি আমার আচরণ সেইরকম হওয়া উচিত। কান্ট এই নীতিতে বিশ্বাসী। স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। আমরা জানি 'জন্মিলে মরিতে হবে।' কিন্তু এই মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক হবে না শান্তির দূত হবে – সেটাই বিবেচ্য। যদি কোন ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত হয় যার উপশম চিকিৎসা বিজ্ঞানে নেই সেক্ষেত্রে অসহ্য শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করে জীবনকে দীর্ঘায়িত করা নিয়তির পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে কোন প্রাণঘাতি ইনজেকশন বা অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করে স্বস্তিমৃত্যুর আশ্রয় নেওয়াকে সকলে সমর্থন করবে বলে আশা রাখি।

মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মত সব ঘটনারই ভালো-মন্দ থাকে, স্বস্তিমৃত্যুও এর ব্যতিক্রম নয়। আমরা এটাও জানি বেঁচে থাকার অধিকার সকলেরই আছে। এছাড়া চিকিৎসা ব্যবস্থা যতই উন্নত হোক, ত্রুটিমুক্ত নয়। যে রোগকে আমরা অনারোগ্য বলে মনে করছি হয়তো বাস্তবে তার থেকেও মুক্তিলাভ সম্ভব হতে পারে। আবার এই স্বস্তিমৃত্যুর কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়াও আছে। বিশেষত সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে যে রোগ নিরাময় করা দুঃসাধ্য তাকে সারিয়ে তোলার জন্য চিকিৎসক আপ্রাণ চেষ্টা না করে রোগীকে ইনজেকশন দিয়ে হত্যা করতে পারেন তার কারণ

স্বস্তিমৃত্যু সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্বস্তিমৃত্যুর দোহাই দিয়ে যে কেউ যে কোনো পরিস্থিতিতে অপরের প্রাণহরণ করতে পারে, হয়তো সেখানে আসল উদ্দেশ্য সম্পত্তি লাভ বা পরশ্রীকাতরতা।

যেভাবেই আমরা দেখিনা কেন স্বস্তিমৃত্যু যে সমর্থনযোগ্য তা অনস্বীকার্য। জীবনে বেঁচে থেকে নরক যন্ত্রণা লাভ অপেক্ষা শান্তির মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা আমার মনে হয় সকলেরই কাম্য। স্বস্তিমৃত্যু স্বতঃউত্তম। এর কুফল বর্তায় অপব্যবহারকারিদের উপর। আমাদের জীবনে চাওয়া হল, যতদিন বাঁচবো, বাঁচার মত করে বাঁচবো। ইহলোকে 'মরিবার সাধ' তখনই হয় যখন সমাজ সংসার তথা নিজের জীবনে আর কিছুই পাওয়ার থাকে না অনন্ত অসহনীয় যন্ত্রণা ছাড়া। তাই বলি অধিকাংশ সময়ই স্বস্তিমৃত্যু আমাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ।

References (গ্রন্থপঞ্জি)

আনন্দবাজার পত্রিকা (১৮ মার্চ, ২০১৮)।

ইসলাম রফিকুল মো (২০২২)। *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা।* রদ্ধ প্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

এইসময় (১৮ মার্চ, ২০১৮)।

এইসময় (৯ এপ্রিল, ২০১৮)।

খালেক আবদুল এ.এস.এম (২০০৯)।*প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা* (তৃতীয় মুদ্রণ)। অনন্যা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

গুপ্ত দীক্ষিত (২০০২)। *নীতিবিদ্যা ও ফলিত নীতিবিদ্যা।* সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা – ৭০০ ০০৯।

চক্রবর্তী সোমনাথ (২০১১)। *কথায় কর্মে এথিক্স।* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০ ০৭৩।

পাল সন্তোষ কুমার (২০২১)। *ফলিত নীতিশাস্ত্র* (তৃতীয় সংস্করণ. প্রথম খন্ড)। লেভান্ট বুকস ইন্ডিয়া, কলকাতা – ৭০০ ০৭৩।

সরকার স্বপ্না (২০২২)। নীতিবিদ্যা: ফলিত পরিবেশ ও অধিনীতিবিদ্যা। মিত্রম্, কলকাতা – ৭০০০৭৩।

সিঙ্গার পিটার (২০১৫)। প্র্যাক্টিক্যাল এথিক্স। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি – ১১০ ০০২

সিঙ্গার পিটার (২০১১)। *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*(রায় প্রদীপ কুমার, অনুবাদ)। নয়া উদ্যোগ, কলকাতা – ৭০০ ০০৬।